রাষ্ট্রীয় সংগঠন
State Enterprise

৭

পূর্ববর্তী ইউনিটগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি যে, সৃষ্টির আদিকাল হতেই মানুষ তাদের প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শিখেনি, যখন তারা গুহায় বসবাস করতো এবং প্রকৃতি প্রদত্ত সামগ্রী ভক্ষণ করেই জীবন নির্বাহ করতো ঠিক তখন থেকেই কারবারের শুরু। তৎকালে মানুষের কারবারের ওপর সরকারি বা গোত্রীয় নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রশ্নই ছিলো না। পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ যখন সভ্যতার যুগের দিকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে এলো, সমাজে বসবাস করতে শিখলো, সমাজে শাসিত ও শাসক শ্রেণির জন্ম নিলো তখনই কারবারের হাতে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের শিকল পরতে লাগলো। এভাবে ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীটা কতিপয় রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে মানুষেরা বিভিন্ন জাতিতে নিজেদের পৃথক করে নিলো। এ পর্যায়ে কারবার রাষ্ট্র পরিচালকদের সুবিধা, অসুবিধা ও আদেশ-নির্দেশের করায়ত্ব হয়ে পড়লো। বিভিন্ন দেশের সরকার দেশের জনগণের বা নিজেদের সুবিধার্থে বা অন্য কোনো কারণে করবারকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। আর এরই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। গতিশীলতা ব্যাহত হলেও পরবর্তীতে দেখা যায় দেশ এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে লাগামহীন পর্যায়ে কারবারি জগতকে ছেড়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ ইউনিটে আমরা রাষ্ট্রীয় সংগঠন কী, কেনো এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১: রাষ্ট্রীয় সংগঠন: উপক্রমনিকা
পাঠ - ২: রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ - ৩: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠন

পাঠ ৭.১ রাষ্ট্রীয় সংগঠন: উপক্রমনিকা
State Enterprise: An Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রীয় সংগঠন কী বলতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দেশের সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। লাগামহীন পর্যায়ে ব্যবসায় জগৎকে ছেড়ে দেওয়া অযৌক্তিক, এ বিবেচনা থেকে সমাজতন্ত্রের মতবাদ থেকে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের জন্ম। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই কোনো না কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেখা যায়। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, যে সব ব্যবসায় সংবেদনশীল কিংবা জনকল্যাণের নিমিত্তে সেই সব ব্যবসায়গুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকাই শ্রেয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সচরাচর মুনাফাভোগী হয় না বরং জনসেবায় নিয়োজিত থাকে। এ পাঠে আমরা রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবো।

রাষ্ট্রীয় সংগঠন কী?
What is state enterprise?

এক কথায় বলতে গেলে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ব্যবসায়ই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বা সংগঠন। সাধারণত জনস্বার্থে কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে সরকার এ ধরনের ব্যবসায়ের মালিকানা গ্রহণ করে থাকেন। নতুন করে স্থাপন বা বর্তমান প্রচলিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয়ত্তকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকার সমস্যার সমাধান, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম বণ্টন ও যথাযথ ব্যবহার, দেশ রক্ষা, জনকল্যাণ, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলতে সরকার কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপন অথবা বিশেষ আদেশের বলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আনয়নের মাধ্যমে সরকার বা সরকারি প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কেই বোঝায়। অন্য কথায়, স্থাপন বা জাতীয়করণের মাধ্যমে আত্মীকৃত এবং পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরকারি কোনো দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে সরকারি কর্মচারী বা প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যবসায়ের মুনাফা সরকারি ইচ্ছায় জনকল্যাণার্থে ব্যয়িত হয়।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of state enterprise

কতিপয় নিজস্বত্ব বা বৈশিষ্ট্যের গুণেই রাষ্ট্রীয় কারবার বিশ্বে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **গঠনপ্রণালী:** দেশের সরকারের বিশেষ আদেশ বলে, রাষ্ট্রপতির আদেশে বা আইনসভার বিশেষ বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপিত বা জাতীয়করণকৃত হয়ে থাকে। এ ধরনের ক্ষেত্রে নতুন কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা পূর্বেকার কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কারবারের জন্ম।

২. **কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা:** রাষ্ট্রপতির আদেশে কিংবা বিশেষ আইনে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে রাষ্ট্রীয় কারবারের ক্ষেত্রে পৃথক বা কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা থাকে। এরূপ কারবারের নামে মামলা দায়ের করা যাবে এবং কারবারও নিজেই অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে।

৩. **মালিকানা:** রাষ্ট্রীয় কারবারের একচ্ছত্র মালিক রাষ্ট্র। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার অর্ধেকের চেয়ে কম মূল্যের শেয়ার জনগণের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শেয়ার মালিকগণ এবং সরকার উভয় পক্ষই কারবারের মালিক হিসেবে গণ্য হয়।

৪. **স্থায়িত্ব:** রাষ্ট্রীয় কারবারের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। সরকার কোনো কারবারের প্রয়োজনীয়তা নেই মনে করলে তার বিলোপসাধন করতে পারেন। বিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোম্পানির আইনানুগ পৃথক ব্যক্তি সত্তা থাকা সত্ত্বেও সরকার কারবারটি অপ্রয়োজনীয় মনে করলে বিলুপ্ত করে দিতে পারেন।

৫. **মুনাফা বণ্টন:** রাষ্ট্রীয় কারবারের লাভ-লোকসানের ভোগকারী সরকার নিজেই। তবে আংশিক বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির ক্ষেত্রে মুনাফাও শেয়ার অনুপাতে সরকার এবং শেয়ার মালিক জনগণের মধ্যে ভাগ হয়।

৬. **ঝুঁকি:** রাষ্ট্রীয় কারবারের ঝুঁকি সরকারই বহন করেন। কোম্পানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমিত।

৭. **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার নিজেই রাষ্ট্রীয় কারবারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্য চালিয়ে থাকেন। অর্থাৎ সরকার নিযুক্ত কর্মচারীরাই এ কাজ করে থাকে।

৮. **বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন:** রাষ্ট্রীয় কারবার সাধারণত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে। সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এরূপ উদ্যোগ নেন। আবার কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বা এলাকায় কারবার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও সরকার এরূপ কারবার স্থাপন করতে পারেন।

৯. **শেয়ারের মালিকানা:** কোম্পানির ক্ষেত্রে সাধারণত সরকার সমুদয় শেয়ার কিংবা শেয়ারের সিংহ ভাগ ক্রয় করে থাকেন।

১০. **স্বায়ত্তশাসন:** রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে পরিচালিত হয়। সরকারই এ পরিচালকমণ্ডলী মনোনীত করেন।

১১. **কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য:** রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জনকল্যাণ সাধন করা। কোনো অবস্থাতেই অধিক মুনাফা অর্জন করা নয়।

১২. **জাতীয় সংসদে কৈফিয়ত তলব:** রাষ্ট্রীয় কারবারের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে জাতীয় পরিষদে বিতর্কের অবতারণা হতে পারে, এক্ষেত্রে সরকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে এসবের জবাব দিতে হবে।

১৩. **লাল ফিতার দৌরাত্ম্য:** সরকারী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতিফলন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় দেখা যায়।

১৪. **আকার:** সাধারণত বৃহদাকার কারবারগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গঠিত হয়ে থাকে।

১৫. **দায়দায়িত্ব:** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব সীমিত। আবার শেয়ার বিক্রয় করা হলে শেয়ার মালিকদের দায়ও সীমিত।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্য

Objectives of state enterprise

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্পদের গতিশীলতা সৃষ্টি, দেশ রক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনে সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পত্তন করেন। যে সমস্ত উদ্দেশ্যে বা কারণে সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠন গঠন করেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. **একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান:** ব্যক্তিগত মালিকানায় কোনো বিশেষ ব্যবসায় শুরু করা হলে যদি সরকার মনে করেন যে, এতে একচেটিয়া পদ্ধতি চালু হতে পারে এবং এর কুফলগুলো দেশের জন্য ক্ষতিকারক হবে তখন সে ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গঠন করা হয়।

২. **নোট প্রচলন ও ব্যাংকিং পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দেশে নোট প্রচলনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকে। বেসরকারি পর্যায়ে নোট প্রচলনের দায়িত্ব দেওয়া হলে যে কোনো সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত নোট ইস্যুর মাধ্যমে বাজারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। তদুপরি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনাও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

৩. **দেশ রক্ষায় শিল্প:** যে সমস্ত শিল্প কারখানা বহিশত্রুর আক্রমণ হতে দেশ রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানর জন্যে পরিচালিত হয় তা অবশ্যই সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে।

৪. **সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা:** দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সরকার চালু ব্যবসায়গুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন এবং নতুন করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করতে পারেন।

৫. **সম্পদের সুষম বণ্টন:** দেশের সম্পদকে কতিপয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ না দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় শুরু করতে পারেন।

৭. **দুর্নীতি দমন:** বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবসায়ের দুর্নীতি অনুসৃত হতে পারে। এর ফলে দেশ ও জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় সরকার কোনো বিশেষ ব্যবসায় হতে দুর্নীতি দূর করার জন্য তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গঠন করতে পারেন।

৮. **অপচয় রোধ:** সরকার যদি মনে করেন, কোনো বিশেষ ব্যবসায় বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত বা পরিচালিত হলে জাতীয় সম্পদের অপচয় হতে পারে তবে অপচয় রোধকল্পে সেই ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গঠিত হতে পারে।

৯. **বিশেষ সেবামূলক বিভাগ:** ডাক, তার, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মতো বিশেষ জনসেবামূলক ব্যবসায়গুলো জনস্বার্থে সরকার নিজ দায়িত্বে পরিচালনা করেন।

১০. **অতি বিনিয়োগমূলক ব্যবসায়:** কোনো কোনো ব্যবসায় আছে যাতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, তদুপরি আয়ের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম। এগুলো সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন: রেলওয়ে।

১১. **জীবন রক্ষাকারী পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন:** ঔষধ বা এরকম জীবন রক্ষাকারী পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন অনেক সময় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন হয় বলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপিত হতে পারে।

১২. **মাদক দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বণ্টন:** বিশ্বের কোনো কোনো দেশে মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকায় ঐ সব দেশে শুধুমাত্র রপ্তানি ও বিদেশিদের নিকট বিক্রয়ের জন্য মাদক দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। তাই এর বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবসায় শুরু করেন।

১৩. **মূল্যের স্থিরতা রক্ষা:** ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়ে দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক ওঠানামা বন্ধ করার জন্য সরকার কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য নিজ আওতাধীনে আনতে পারেন।

১৪. **দ্রব্যের উৎকর্ষতা বজায়:** পণ্যদ্রব্যের মান বজায় ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কিছু ব্যবসায় নিজ মালিকানায় আনতে পারেন।

১৫. **শিল্পায়ন:** দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি মালিকানার পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠা করে থাকেন।

১৬. **ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে বিনিয়োগ:** দেশের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও সাফল্য অনিশ্চিত থাকায় কোনো শিল্পে যখন বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ উৎসাহ দেখায় না তখন সরকার সেখানে বিনিয়োগ করেন। কর্ণফুলী পেপার মিলস এভাবেই স্থাপিত হয়েছিল।

১৭. **দেশের সব এলাকায় শিল্প স্থাপন:** দেশের অনুন্নত এলাকাগুলোতে শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকার শিল্প স্থাপন করতে পারেন। কারণ অনুন্নত এলাকায় বেসরকারি মালিকানায় কেউ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবে না।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটি দেশে এর গুরুত্বও অনেক রয়েছে। আসুন তাহলে জেনে নিই এ ধরনের সংগঠনগুলোর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কী।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের গুরুত্ব

Importance of state enterprise

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দেশে এমন কিছু শিল্প বা ব্যবসায় ক্ষেত্র রয়েছে যে সব ক্ষেত্রকে জাতীয় স্বার্থে বেসরকারী মালিকানায় প্রদান করা সম্ভব হয় না। যেমন– হাতিয়ার প্রস্তুতকারী শিল্প, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা নোট প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি। এসব ব্যবসায় সর্বদাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট সেখানে বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যবসায় ক্রমে শ্রেণি বৈষম্য বাড়ায়। অর্থাৎ ধনী লোক আরো ধনী হয় এবং গরিব লোক আরো গরিব হয়। এমতাবস্থায় দেশের সম্পদ যাতে কতিপয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় শুরু করেন। আবার দেশকে দ্রুত শিল্পায়িতকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ইত্যাদির লক্ষ্যেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপিত হয়ে থাকে। জনগণের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ বা এ ধরনের অন্যান্য ব্যবসায় যা কোনো ব্যক্তির মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবার সুযোগ হলে জনগণের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে সেগুলো কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানায়ই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সর্বোপরি ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় অধিক মুনাফা অর্জন। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রধানতম উদ্দেশ্য হবে জনকল্যাণ সাধন ও সম্পদের সুষম বণ্টন। সমস্ত ব্যবসায় বেসরকারি মালিকানায় স্থাপিত হবার সুযোগ দিলে শুধুমাত্র অতি মুনাফার নিশ্চয়তা বা সম্ভাবনা বিশিষ্ট ব্যবসায়গুলোই একতরফাভাবে গড়ে ওঠবে। কোনো ব্যক্তি মালিকই জনকল্যাণার্থে কম মুনাফা বা ঝুঁকিবহুল কারবারের দিকে এগুতে চাইবেন না। কোনো মেয়ের মুখমণ্ডল যদি অত্যন্ত সুন্দর, নিরোগ ও প্রসাধনী সমৃদ্ধ হয় এবং তার সারা শরীরে যদি খোস-পাঁচড়া ভর্তি থাকে তবে তাকে যেমন স্বাস্থ্যবতী বা সুন্দরী কিংবা নিরোগ বলা যাবে না– একটি দেশের ক্ষেত্রে কারবারের কোনো কোনো খাত চরমভাবে উন্নতি লাভ করেও যদি অন্যান্য খাত অনুন্নত থেকে যায় তবে তাকে উন্নত বা উন্নয়নশীল কিংবা সুন্দর অর্থনীতির দেশ বলা যাবে না। আবার ডাক, তার, রেল এ ধরনের ব্যবসায়ে কেউ এগিয়ে না এলেও অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এগুলোর সেবা অপরিহার্য। এতসব বিবেচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোনো দেশের বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়শীল দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় কারবারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলতে সরকার কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপন অথবা বিশেষ আদেশের বলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আনয়নের মাধ্যমে সরকার বা সরকারি প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কেই বোঝায়। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরকারি কোনো দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে সরকারি কর্মচারী বা প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যবসায়ের মুনাফা সরকারি ইচ্ছায় জনকল্যাণার্থে ব্যয়িত হয়। কতিপয় নিজস্বত্ব বা বৈশিষ্ট্যের গুণেই রাষ্ট্রীয় কারবার বিশ্বে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্পদের গতিশীলতা সৃষ্টি, দেশ রক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনে সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পত্তন করেন। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বা কারণে সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠন গঠন করেন। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের উদ্দেশ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটি দেশে এর গুরুত্বও অনেক রয়েছে।

পাঠ ৭.২ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ
Classification of State Enterprise

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরকারি বিভাগীয় সংগঠন কী বলতে পারবেন।
- বোর্ড প্রশাসিত সরকারি সংগঠন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা কী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরকারি যৌথ মূলধনী কোম্পানি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বৃহত্তর যুক্তি রয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখবো, কোনো দেশ ধনতান্ত্রিক এবং কোনো দেশ সমাজতান্ত্রিক। এ বিষয়ে বিভিন্ন লোকের রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য, ব্যক্তিগত মতামত, চিন্তাধারার বিকাশ এবং পারিপার্শ্বিকগত ভিন্নতার কারণে প্রত্যেকেই পৃথক দৃষ্টিকোণ হতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন। মতামতের এ ধরনের ভিন্নতার প্রতিচ্ছবি আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মধ্যে দেখতে পাই। এ পাঠে আমরা বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রীয় সংগঠন নিয়ে আলোচনা করবো।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ
Classification of state enterprise

রাষ্ট্রীয় সংগঠন সাধারণত চার প্রকার। যথা:

১. সরকারি বিভাগীয় সংগঠন,
২. বোর্ড প্রশাসিত সরকারি সংগঠন,
৩. বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও
৪. সরকারি যৌথ মূলধনী কোম্পানি।

বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. সরকারি বিভাগীয় সংগঠন (Government Departmental Organization)

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বা কারণে সরকার যখন মনে করেন যে সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে কোনো রাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তোলা ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন তখন এরূপ সংগঠন গঠন করেন। পরিপূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সরকার এ সংগঠনগুলো স্থাপন করেন। এগুলো সাধারণত জাতীয় সংসদে অনুমোদনের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারে গঠিত হয়। কোনো মন্ত্রণালয় এ সংগঠনগুলো সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করে থাকে।
উদাহরণ: বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **মূলধন:** সরকারি বিভাগীয় সংগঠন স্থাপনের নিমিত্তে সমস্ত মূলধন সরকারই সরবরাহ করে থাকেন। সরকার সাধারণত নিজ তহবিল হতে বা ঋণ করে এ ধরনের মূলধনের যোগান দেন।
- **দায়দায়িত্ব:** এরূপ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সম্পদের মালিক যেমন সরকার, সমস্ত ঋণের দায়িত্বও সরকারই বহন করে থাকেন।

- **পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা:** সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মচারীগণ এরূপ সংগঠন পরিচালনা করে থাকেন।
- **মুনাফা বণ্টন:** কেবলমাত্র সরকারি তহবিলেই এ ধরনের সংগঠনের মুনাফা জমা হয়। অবশ্য লোকসানের বোঝাও সরকারই বহন করেন।
- **সরকারি প্রশাসনের অঙ্গ:** আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধুমাত্র ব্যবসায় হিসেবে বিবেচনা না করে সরকারি প্রশাসনের বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- **আইনগত মর্যাদা:** কোনোরূপ আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এরূপ প্রতিষ্ঠানের আইনগত কোনো মর্যাদা নেই। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নামে আদালতে মামলা দায়ের করা যায় এবং প্রতিষ্ঠানও অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে।
- **স্থায়িত্ব:** এসব প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তবে সাধারণত এরূপ ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা জনগণের কল্যাণে এত বেশি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে সহজে এরূপ প্রতিষ্ঠান উঠিয়ে দেওয়া যায় না।

সুবিধা:

সরকারি বিভাগীয় সংগঠনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

- **জাতীয় স্বার্থরক্ষা:** সরকারি বিভাগীয় সংগঠন পরিচালনার মাধ্যমে সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার যোগান নিশ্চিত করে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে থাকেন।
- **উন্নত ব্যবস্থাপনা:** সরকার অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি কর্মচারীগণকে দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন। ফলে দক্ষ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশ এর সুফল ভোগ করে।
- **গোপনীয়তা রক্ষা:** যেহেতু সরকারি কর্মচারীগণ এ ধরনের সংগঠন পরিচালনা করে থাকেন, সুতরাং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ গোপনীয়তা রক্ষা করা খুব সহজ হয়।
- **জাতীয় অগ্রগতি:** সরকারি তত্ত্বাবধানে অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।
- **কর্মচারীদের উৎসাহ:** কারবারি প্রতিষ্ঠানে জড়িত থেকেও সরকারি পদমর্যাদা ও সম্মান ভোগ করায় কর্মচারীগণ কাজের প্রতি উৎসাহী হয়ে থাকেন। তদুপরি সরকার লভ্যাংশ ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে কর্মচারীদের প্রেষণা দিতে পারেন।
- **কর্মচারীদের সচেতনতা:** এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ও আয়ব্যয় সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয় বলে কর্মচারীগণ পূর্বাহ্নেই সচেতনভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তদুপরি জনগণও এসব প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত বিশদভাবে জানতে পারে।

অসুবিধা:

- **আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য:** প্রতিটি সরকারি বিভাগের মতোই এসব প্রতিষ্ঠানে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য খুব বেশি থাকে। এর ফলে লাল ফিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বহু সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হয়।
- **কর্মচারীদের মনোভাব:** কর্মচারীদের চাকুরির নিরাপত্তা থাকায় তারা কখনো উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে চায় না এবং প্রায়শঃই কাজের প্রতি অনিহা দেখায়।
- **কর্মচারীদের বদলি:** প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারী বলে তাদেরকে প্রায়ই অন্য বিভাগে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলি করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়।
- **অপব্যয় ও অপচয়:** 'সরকার কা মাল দরিয়ামে ঢাল'– এ ঘৃণ্যতম নীতিটি প্রায়শ:ই এরূপ প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয়। সরকারি সম্পদকে অনেকেই আপন বলে মনে করে না ফলে অপব্যয় ও অপচয় বাড়ে। তদুপরি জাতীয় সংসদে পৃথকভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্র ও আয়ব্যয় হিসাব দাখিল করতে হয় না বলে লোকসানের পরিমাণ সকলে জানতে পারে না।

- **বারংবার নীতি পরিবর্তন:** বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান দেশগুলোতে সরকার পরিবর্তন বা মন্ত্রী পরিবর্তন হেতু প্রতিষ্ঠানের নীতিরও পরিবর্তন হয়। যা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।
- **কর্মচারীদের ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাব:** যেহেতু কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারী এবং তারা অনেক সময় সাময়িকভাবে অন্য অফিস হতে বদলি হয়ে আসেন, সুতরাং তাদের ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাব থাকাই স্বাভাবিক। এতে করে প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য ব্যাহত হয়।

২. বোর্ড প্রশাসিত সরকারি সংগঠন (Board-managed governmental organization)

কতকগুলো ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকার বোর্ড গঠন করে নিজ মালিকানায় ও তত্বাবধানে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এসব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে বটে, কিন্তু সরকার তা সার্বক্ষণিক তত্বাবধান করেন না। অবশ্য কোনো বিশেষ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এসব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বোর্ডের পরিচালকগণ সরকার কর্তৃকই নির্বাচিত হন।

উদাহরণ: বাংলাদেশ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **মূলধন:** এ ধরনের কারবারি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্তে সমুদয় মূলধন সরকারই সরবরাহ করে থাকেন।
- **মালিকানা:** দেশের সরকার বা রাষ্ট্রই এককভাবে এসব কারবারের মালিক।
- **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্য দেখার জন্য সরকারই লোক নিয়োগ করে থাকেন। সরকারি বিভাগীয় সংগঠনের মতোই এগুলো পরিচালিত হয়।
- **আইনগত মর্যাদা:** আপাতঃদৃষ্টিতে এসব প্রতিষ্ঠানকে পৃথক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলোর আইনগত কোনো মর্যাদা বা পৃথক সত্তা নেই। কারণ এগুলো পরিপূর্ণভাবে সরকারি সংগঠন। তবে প্রতিষ্ঠানের নামে মামলা দায়ের করা চলে এবং অন্যের বিরুদ্ধেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মামলা দায়ের করা যেতে পারে।
- **স্থায়িত্ব:** মোটামুটিভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থায়ী। সাধারণত: সরকার পরিবর্তিত হলে নীতিমালায় যৎসামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়।
- **দায়দায়িত্ব:** আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারই বহন করে থাকেন।
- **মুনাফা বণ্টন:** দেশের সরকারই এসব প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একক ভোগকারী। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের আয়কে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। অবশ্য কখনো মুনাফার অংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে ব্যয়িত হয়।

সুবিধা:

- **জনকল্যাণ সাধন:** এসব ব্যবসায়ের ওপর সরকারের একচ্ছত্র মালিকানা থাকায় ইচ্ছেমতো পরিচালনা করে জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও জনকল্যাণ সাধন করা যায়।
- **সরকারি আয় বৃদ্ধি:** আলোচ্য প্রতিষ্ঠান হতে আগত সমস্ত আয় সরকার ভোগ করেন বলে এসব ব্যবসায়ের ফলে সরকারি আয় বাড়ে।
- **জাতীয় সংসদে আলোচনা:** এসব ব্যবসায়ের আয়ব্যয়, পরিচালনা, নীতি, পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় বলে দেশের জনগণ এর দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগত হতে পারে, তদুপরি ব্যবসায়টি এসব সংশোধনের সুযোগও পায়।
- **কর্মচারীদের উৎসাহ:** যেহেতু এসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকেন বলে তারা কাজকর্মে অধিক উৎসাহী হয়ে থাকেন।
- **গোপনীয়তা রক্ষা:** প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বতোভাবে সরকারি এবং এর কর্মচারীগণও সরকারি বলে এর গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

অসুবিধাঃ

- **লালফিতার দৌরাত্ম্যঃ** এ ধরনের প্রতিষ্ঠানও মূলত: সরকারি বিভাগীয় সংগঠনেরই ভিন্নতর রূপ। ফলে এ ক্ষেত্রেও আমলাতান্ত্রিক নীতি ও লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।
- **কর্মচারীদের ব্যবসায়িক নৈপুণ্যের অভাবঃ** সরকারি কর্মচারীদের ব্যবসায়িক নৈপুণ্য তুলনামূলকভাবে কম থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত নাও হতে পারে।
- **জাতীয় সংসদে গোঁজামিল প্রদানঃ** জাতীয় সংসদে এসব প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয় বটে, তবে সেখানে পেশকৃত অনেক কিছু শুধুমাত্র কাগুজে।
- **পৃথক হিসাবের অভাবঃ** এসব প্রতিষ্ঠানের আয়ব্যয় সরকারি অন্যান্য দপ্তরের আয়ব্যয়ের সাথে একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়। ফলে লাভ বা লোকসান যাই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বা দুর্নাম হয় না।
- **রাজনৈতিক অস্থিরতাঃ** রাষ্ট্রীয় নীতি বা সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিও বদলে যায়। ফলে অতীত কার্যকলাপের সাথে তাল মিলিয়ে চলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৩. বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা (Statutory corporation)

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দেশের কোনো বিশেষ আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যদি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় তবে তাই হবে বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা। এরূপ প্রতিষ্ঠান সংস্থা হিসেবে বা প্রায় সংস্থার মতোই কাজ করে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকারি তত্বাবধানে পৃথক পরিচালনা পর্ষদ তৈরি করা হয়। পরিচালিত পর্ষদে সরকারি এবং বেসরকারি এ দুশ্রেণির লোকই থাকতে পারেন।

উদাহরণঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **মালিকানাঃ** এ ধরনের মালিক সরকার। রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থেই এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়।
- **মূলধন সরবরাহঃ** সরকার এরূপ প্রতিষ্ঠানের মালিক বলে পুরো মূলধন সরকারই সরবরাহ করে থাকেন।
- **আইনগত মর্যাদাঃ** এরূপ সংস্থার আইনগত মর্যাদা বা সত্তা রয়েছে। হিসাবপত্র রাখা, সংগঠন, পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এরূপ প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।
- **ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণঃ** সরকার নিয়োজিত পরিচালকমণ্ডলী এরূপ সংস্থার ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করেন। এ ধরনের সংস্থার কোনোরূপ পরিচালনা বিধি (Articles of Association) না থাকলেও যে আইনে এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় সে আইনেই তা লিখিত থাকে।
- **স্থায়িত্বঃ** এরূপ প্রতিষ্ঠানে মোটামুটিভাবে স্থায়ী ধরনের। পৃথক পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হলেও যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি মালিকানাধীনে, সেহেতু এগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকাল টিকে থাকে।
- **ঝুঁকিঃ** যেহেতু দেশের সরকার সমস্ত মূলধন সরবরাহ করে থাকে সুতরাং ঝুঁকিও সরকারই বহন করে।
- **মুনাফা বণ্টনঃ** এ সমস্ত সংস্থার সমস্ত মুনাফা সরকার ভোগ করেন এবং লোকসানের জন্যও সরকারই দায়ী হন।
- **স্বায়ত্তশাসনঃ** এরূপ সংস্থা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এগুলো সাধারণত স্বায়ত্তশায়িত হয়। অবশ্য এদের কার্যাবলির জন্য এরা কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়ী থাকে।

সুবিধাঃ

- **গঠনের উদ্দেশ্যঃ** এগুলো সাধারণত জনকল্যাণ ও জনস্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত হয়।
- **আমলাতন্ত্রের শিথিলতাঃ** বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো যেহেতু সরাসরি সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট নয়, সুতরাং আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি বা লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এক্ষেত্রে কম।

- **দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ:** স্বায়ত্তশাসনে পরিচালিত বলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে নিজ দায়িত্বে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।
- **অর্থ বিষয়ক স্বাধীনতা:** আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে আয়ব্যয়, ঋণ গ্রহণ বা প্রদান বা ইত্যকার অন্যান্য বিষয়ে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং পরিচালকগণ প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে অনুরূপ ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন বা ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।
- **কর্মচারীদের উদ্যম:** সরকারি আইনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা নয় বলে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতোই উদ্যমশীল হয়ে থাকে।
- **বাস্তবমুখী আইন:** কোম্পানির মতো এসব প্রতিষ্ঠান গদবাধা আইনে চলে না। বরং এসব প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য যে আইন রচিত হয় তাতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে পৃথক পৃথক আইন রচনা করা যায়।
- **স্থায়িত্ব:** এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থায়ী। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলা হয় না। সুতরাং জনগণের পরিপূর্ণ আস্থা প্রাপ্তি সম্ভব হয়।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** যে কোনোরূপ সিদ্ধান্তের জন্য সরকারি দপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠানো দরকার হয় না বলে এসব প্রতিষ্ঠানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

অসুবিধা:

- **নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন:** এরূপ সংস্থা প্রকৃতপক্ষে নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে থাকে। এগুলোর যে কোনো জটিল ও বড় ধরনের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পাঠাতে হয়। এর ফলে লাল ফিতার দৌরাত্ম এখানেও চলে।
- **কার্যপ্রণালীর অপরিবর্তনশীলতা:** এসব সংস্থার কার্যপ্রণালী আইন সৃষ্ট এবং তা মোটেই পরিবর্তনশীল নয়। সুতরাং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এসব প্রতিষ্ঠান তাদের নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী বদলাতে হবে না।
- **সেবামূলক উদ্দেশ্য:** মুনাফা অর্জনের বদলে সেবামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বলে এদের সফলতা সম্পর্কে পরিমাপ করা যায় না।
- **অপচয়:** ব্যয়ের ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে বলে এসব প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অপচয় করে থাকে। ফলে মুনাফা কম হয়।
- **ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাব:** লোক নিয়োগ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব সংস্থা সরকারি অফিসের মতো হওয়ায় কর্মকর্তাগণের অনেক সময় ব্যবসায়িক জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব থাকে।
- **কর্মচারীদের উৎসাহহীনতা:** কর্মচারীদের চাকুরির নিশ্চয়তা থাকায় এবং তাদের বেতন কাঠামো সরকারি দপ্তরগুলোর মতো হওয়ায় কর্মচারীগণ তাদের কাজে উৎসাহহীন হয়ে পড়ে।

৪. সরকারি যৌথ মূলধনী কোম্পানি (Government joint-stock company)

এ ধরনের কোম্পানি বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে গঠিত হয়। তবে এর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক সরকার নিজেই হয়ে থাকেন। এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণ যৌথ মূলধনী কোম্পানির মতোই, তবে ব্যবসায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার জন্য সরকার কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার ক্রয় করে থাকেন।
উদাহরণ: হস্তচালিত তাঁতজাত পণ্য রপ্তানি সংস্থা লিমিটেড, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, পুবালী ব্যাংক লিমিটেড।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **গঠন প্রণালী:** সরকারি উদ্যোগে কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।
- **মূলধন সরবরাহ:** শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে এরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগৃহীত হয়ে থাকে।
- **আইনগত মর্যাদা:** প্রতিষ্ঠানটি আইনসৃষ্ট; সুতরাং এদের আইনগত মর্যাদা আছে। অন্যান্য কোম্পানির মতোই এগুলোও পৃথক সত্তার অধিকারী।

- **স্থায়িত্বঃ** এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী। শেয়ারের হাত বদল বা শেয়ার মালিকদের মৃত্যুর ফলে এ ধরনের কোম্পানি ভেঙ্গে যায় না।
- **ঝুঁকিঃ** এসব প্রতিষ্ঠানের দায় সীমিত। শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক কেনা শেয়ারের মূল্যের সমপরিমাণ ঝুঁকি প্রত্যেকেই বহন করেন।
- **মুনাফা বণ্টনঃ** শেয়ারের মালিকগণ তাদের শেয়ারের সংখ্যানুপাতে মুনাফার অংশ পেয়ে থাকে। সরকার কোম্পানির প্রধান শেয়ার মালিক বলে মুনাফার সিংহভাগ সরকারই পায়।
- **পরিচালকমণ্ডলীঃ** আলোচ্য কোম্পানি পরিচালনার জন্য সরকার এবং অন্যান্য শেয়ার মালিকগণ পৃথকভাবে শেয়ারের অনুপাতে পরিচালক নির্বাচন করে থাকেন।
- **শেয়ারের মালিকানাঃ** এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত অধিকাংশ শেয়ারের মালিকানা সরকারের হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার শতকরা ৫১ ভাগ এবং জনগণ শতকরা ৪৯ ভাগ শেয়ার ক্রয় করে থাকেন।

সুবিধাঃ

- **আইনগত সত্তাঃ** সরকারি যৌথ মূলধনী কোম্পানির আইনগত পৃথক সত্তা আছে বলে মূলধন, ঋণ ইত্যাদি সংগ্রহ এবং যাবতীয় কার্য পরিচালনায় সুবিধা হয়।
- **পরিচালনাঃ** পৃথক পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয় বলে কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জনকল্যাণ ও অধিক মুনাফা অর্জন- এ দুটোর সমন্বয় ঘটিয়ে স্বাচ্ছন্দে তা পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
- **সরকারের ওপর নির্ভরহীনতাঃ** যেহেতু পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের ওপর এসব প্রতিষ্ঠান নির্ভরশীল নয় সুতরাং সরকার পরিবর্তিত হলে এদের কোনো অসুবিধা হয় না।
- **ব্যবসায়ী মনোভাবঃ** আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্মই মূলত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। এজন্য ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে অতি সহজেই এদের নীতিমালা পরিবর্তিত হয়ে থাকে।
- **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতাঃ** সরকারি যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ারগুলো হস্তান্তরযোগ্য বলে অনেকেই তা কিনতে আগ্রহী হয়।

অসুবিধা

- **সরকারি কর্তৃত্বঃ** শাস্ত্রত এটি সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানার ব্যবসায় হলেও বাস্তবে তা হয় না। কারণ সরকারি শেয়ারের সংখ্যা অধিক হওয়ায় সরকারই কর্তৃত্ব করে থাকেন।
- **তথ্য গোপন রাখার অধিকারঃ** কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নীতি ও পরিচালনা বিষয়ে তারা জাতীয় সংসদে সকল তথ্য প্রকাশে বাধ্য নয়। ফলে বহু অন্যায় কাজও ঢাকা থাকে।
- **কর্মচারীগণের উৎসাহহীনতাঃ** কর্মচারীদের চাকুরি সরকারি নয়, বরং কোম্পানির; এ চিন্তাধারা তাদেরকে কাজের প্রতি অনুৎসাহিত করে। আবার সরকারি সুযোগ-সুবিধাও তারা পায় না।
- **কর সুবিধার অভাবঃ** কোম্পানির ওপর উঁচু হারে কর আরোপ করা হয়। এরা কর মওকুফের সুবিধা পায় না।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রীয় সংগঠন সাধারণত চার প্রকার। যথা: সরকারি বিভাগীয় সংগঠন, বোর্ড প্রশাসিত সরকারি সংগঠন, বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সরকারি যৌথ মূলধনী কোম্পানি। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভিন্নতা থাকার কারণে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা যেমন রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। তদুপরি, এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজ মহিমায় মহিমান্বিত।

পাঠ ৭.৩ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠন: ইতিবৃত্ত
State Enterprises of Bangladesh: History

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কারবারের সমস্যা দূরীকরণের উপায়গুলো বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ইতিহাস খুব পুরোনো নয়। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে আছে। বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে আবার অনেক প্রতিষ্ঠান ধুঁকে ধুঁকে প্রদীপের আলোর মতো টিম টিম করে জ্বলছে। বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন ধরনের আইন-নীতিমালা তৈরি করে এদেরকে চালিয়ে যাচ্ছে। এ পাঠে আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ইতিহাস, সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোকপাত করবো।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠন
State enterprises of Bangladesh

বাংলাদেশ বর্তমানে মিশ্র অর্থনীতির দেশ। এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বকাল হতেই অর্থাৎ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানি আমলেও এদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ছিল। কারণ পাকিস্তানও ছিল মিশ্র অর্থনীতির অনুসারী। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতার বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। পরিশেষে ৯ মাস বহু রক্ত ঝরিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয় স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য।

স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোর অন্যতম হিসেবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে মর্যাদা দেন। আর সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ২৭নম্বর আদেশ মোতাবেক অবাঙ্গালী ও এদেশীয় মালিকদের বহু কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। উল্লেখ্য যে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে দেশের সকল সম্পদের মালিক হবে রাষ্ট্র। ব্যক্তি মালিকানায় কোনো শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান এখানে নেই। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলা এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছে দেবার যুক্তিতেই তৎকালে এসব প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাট শিল্প, বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প-কারখানাসহ ব্যাংক, বিমা ইত্যাদিও ছিল। তবে বিদেশি কতিপয় ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় আনা হয়নি।

আলোচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়নের পর পরই নানাবিধ কারণে উৎপাদন বিমুখতা দেখা দেয়। এ জন্য যুদ্ধোত্তর অস্থিরতা, রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা, রাজনীতিকদের উদাসীনতা, আমলাদের স্বার্থান্ধতা ও স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ইত্যাদি দায়ী। তদুপরি শিল্পগুলোর সাবেক প্রভাবশালী মালিকদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে শিল্প কারখানাগুলো লোকসানের দিকে এগিয়ে যায়। আবার এরই মধ্যে দেশে দেখা দেয় চরম বন্যা ও পরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সবকিছু মিলিয়ে দেশে এক চরম অস্থিরতা তৈরি হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর সকল শ্রেণির কর্মচারীসহ সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ এসব শিল্প হতে নিজেরা স্বার্থ লুঠ করতে থাকেন। এক সময় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর ভবিষ্যত অন্ধকারে লুটোপুটি খেতে থাকে।

১৯৭৫ সালে দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী সময়ে লক্ষ করা হয় যে, এক শ্রেণির লোকের স্বার্থান্ধতায় আলোচ্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলো দেশের সম্পদের বদলে দায়ে পরিণত হয়েছে। অবশ্য বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান লাভজনক ভিত্তিতেও পরিচালিত হচ্ছিল।

রাষ্ট্রীয় কারবার চিন্তাধারাটি দেশের এবং দেশের সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ পদ্ধতি বাস্তবে গণমুখী বা উন্নয়নশীল করার জন্য প্রয়োজন সৎ ও দেশপ্রেমিক পরিচালক ও কর্মচারীর। যতদিন পর্যন্ত উদ্যমী, দক্ষ, সৎ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে এগিয়ে না আসবেন ততোদিন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকসান হবেই। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

অবশেষে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের বোঝা হতে অব্যাহতি নিয়েছেন ১৯৮২ সালে এক সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে। ১৯৮২ সাল হতে আজ পর্যন্ত সরকার কতকগুলো পাট ও বস্ত্রকল, দুটো ব্যাংক এবং আরো কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছেন। আবার বেসরকারি মালিকানায় ব্যাংক, বিমা কোম্পানিসহ যে কোনোরূপ শিল্প গড়ে তোলার জন্যও সরকার অনুমতি দিয়েছেন। উল্লেখ থাকে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় 'সমাজতন্ত্র' আর নেই।

উপরোক্ত আলোচনা হতে লক্ষ করা যায় যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নিয়ে যে টানাহ্যাঁচড়া চলছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় অত্যন্ত কঠিন। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পেছনে যে সাধুবাদ জড়িত তা বাংলাদেশের এসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেছে, আর তাকিয়ে আছে আগামী দিনের নাগরিকদের প্রতি। এমতাবস্থায় বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজকে সততা, দেশপ্রেম, দক্ষতা ও অফুরন্ত সাহস নিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে অনাগত ভবিষ্যতের। বাণিজ্যের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই সে লক্ষ্যে আগামী দিন রচনা করা উচিত, গড়ে ওঠা উচিত সে আঙ্গিকে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর সমস্যাসমূহ বা ত্রুটিসমূহ

Problems of state enterprises of Bangladesh

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তন করে এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎকালীন সরকার কলকারখানা ও বৃহদাকার ব্যবসা-বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ী জগতের কতিপয় ক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্য ও সাফল্য দেখা গেলেও সার্বিক দিক হতে এটি সফল হয়নি। এর পেছনে যেসব কারণগুলো প্রকটভাবে কাজ করে তা হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধে শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, কর্মকর্তাদের অযোগ্যতা ও অসততা, পাকিস্তানি আমলে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রাক্তন মালিকের প্রতি আনুগত্য এবং কর্মচারী নিয়োগ, কেনাবেচা ইত্যাদি সর্বস্তরে যথেচ্ছাচার।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ দেশের ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে কয়েক দফা। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতির তালিকা হতে সমাজতন্ত্রের নাম বাদ পড়েছে। বিভিন্ন মহলের ষড়যন্ত্র, কর্মচারীদের দুর্নীতি ইত্যাদির ফলে ক্রমাগত দেওয়া লোকসানের চাপ হতে বাঁচার জন্য বর্তমান বহু কলকারখানা বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নীতি কেন ব্যর্থ হতে চলেছে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই দেখা দিতে পারে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সমস্যাসমূহ বা ত্রুটিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **বৈদেশিক মুদ্রার সংকট:** স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকার একেবারে শূন্য হাতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসিত করার পাশাপাশি কলকারখানার জন্য যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার প্রচণ্ড সংকট দেখা দেয়।
২. **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** বারংবার সরকার ও সরকারি নীতির পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোরও নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা বিরাজ করছে।
৩. **বিদেশ নির্ভর অর্থনীতি:** বাংলাদেশের অর্থনীতি জন্মলগ্ন হতেই বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এজন্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনেও অনেক সময় অর্থ পাওয়া যায়নি।
৪. **ত্রয়ী পরিচালনা ব্যবস্থা:** সরকারি ব্যবসায়গুলো সাধারণত কোনো মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালকগণের কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়। এমতাবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতির অভাবে শুধুমাত্র

এক দপ্তর হতে অন্য দপ্তরে বিষয়গুলো ঘুরে বেড়ায় এবং দীর্ঘ সময় পরে হয়তো ভুল বা গা ভাসানো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে আসে। অথচ এসব ক্ষেত্রে হয়তো ত্বরিত ও সঠিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল।

৫. **শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক:** শ্রমিকদের কার্য বিমুখতা এবং ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতা ও দুর্নীতি পরায়ণ মনোভাবের জন্য ক্রমে ক্রমে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। বর্তমানেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর বৈরী মনোভাবের ফলে এ সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

৬. **বৈদ্যুতিক শক্তির অনিয়মিত সরবরাহ:** বৈদ্যুতিক শক্তির সার্বক্ষণিক যোগান কোনো শিল্প কারখানার সফলতার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলোতে বিদ্যুত সরবরাহে অনিয়ম দেখা দেয় প্রচণ্ডভাবে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং কাজ ছাড়াই শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন দিতে হয়।

৭. **গবেষণার অভাব:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে তাদের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য তেমন একটা গবেষণা করা হয় না। অথচ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে গবেষণা অপরিহার্য।

৮. **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বনাম বেকার সমস্যা:** ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্ভব হলেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তা হঠাৎ করে সম্ভব হয় না। কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কিছুটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। এরূপ আকস্মিকভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করা হলে বহু শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায় এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

৯. **প্রেষণাহীন পরিবেশ:** সরকারি কারবারে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা শ্রমিকদের বেতন একই ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের বেতন বা পারিশ্রমিকের চেয়ে অনেক কম হয়। তদুপরি ভালো কাজের জন্য কোনো পুরস্কারও থাকে না। ফলে কর্মচারীগণ কাজের প্রতি উৎসাহী নন।

১০. **রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থা:** রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে মেরামত বা রক্ষিত হয় না। ফলে যন্ত্রপাতির উৎপাদনশীলতা ও আয়ু কমে যায়।

১১. **প্রশিক্ষণের সমস্যা:** এমনিতেই আমাদের দেশে শিল্প ও ব্যবসাভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। তদুপরি বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীগণ মধ্যপ্রাচ্য চাকুরি নিয়ে চলে যান। ফলে দক্ষ কর্মী পাওয়া যায় না।

১২. **প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ:** ক্ষমতাসীনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ, সরকারি আমলাদের দুর্নীতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের স্বজনপ্রীতির ফলে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক কর্মচারী এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করে। ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৩. **শ্রমিকের অনুপস্থিতি:** শ্রমিকগণ সাধারণত: স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শহরে থাকতে পারে না। তাই প্রায়শঃই তারা গ্রামে বেড়াতে যায়। তদুপরি ফসল কাটার মৌসুমে বহু শ্রমিক শহর ত্যাগ করে। এতেও শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

১৪. **দ্বৈত অধীনতা:** সরকারি ব্যবসায়গুলো প্রথমত কর্পোরেশন এবং দ্বিতীয়ত মন্ত্রণালয়ের অধীন। এ দ্বৈত অধীনতায় কোনো প্রশাসনই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না।

১৫. **অর্থ বিনিয়োগে বৈষম্য:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলোর মধ্যে অর্থ বিনিয়োগের কোনো সুষম পদ্ধতি বা নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে না। কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক এবং কোনোটিতে প্রয়োজনের কম মূলধন রয়েছে। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনহীন মূলধনের সুদ বহন করছে, কোনো প্রতিষ্ঠানে মূলধনের অভাবে কাঁচামাল ইত্যাদি কেনা যাচ্ছে না রীতিমতো।

১৬. **প্রশিক্ষণহীন কর্মচারী:** রাজনৈতিক চাপ এবং কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে কারিগরি পদসমূহেও প্রশিক্ষণহীন বা বিশেষ যোগ্যতাহীন লোক নিয়োগ করা হয়। আবার এদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থাও নেই।

১৭. **ব্যবস্থাপনার পরিধি:** শিল্প কারখানাগুলোর আয়তন বা কর্পোরেশনগুলোর অধীনে শিল্প ইউনিটের সংখ্যা সমান নয়। জরিপে দেখা গিয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবস্থাপনা পরিধি সমান। এতে সমান দক্ষতার সাথে সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৮. **যোগাযোগে অসুবিধা:** একটি কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন শিল্প ইউনিট দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন কর্পোরেশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা। কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা, ডাক, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ততোটা উন্নত না থাকায় অনুরূপ যোগাযোগ বিশেষ অসুবিধা হয়।

১৯. **সুন্দর পরিচালন বিধির অভাব:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার প্রতিটি স্তরে পরিচালনার জন্যে সন্দুর নিয়মনীতি নেই। এজন্যে প্রতিটি স্তরেই কর্মকর্তাগণ সুষ্ঠুভাবে কোনো উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। তাদেরকে প্রায়শঃই

সিদ্ধান্তের জন্য ওপরওয়ালাদের কাছে সহজ বিষয়াবলিও পাঠাতে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে এ সব বিষয় শুধু টেবিল হতে টেবিলে ঘুরতে থাকে।

২০. **স্পষ্ট দায়িত্বের অভাব:** শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে বা কর্পোরেশনে প্রত্যেক কর্মকর্তার সুস্পষ্ট কোনো দায়দায়িত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে পরিচালকগণকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভাগ করে দিলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার বোঝা শুধু অন্যের উপর চাপানোর মনোভাব এবং এর সুযোগ বিদ্যমান।

২১. **সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলোতে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে নির্ধারণ করা হয় না। অর্থাৎ পরিকল্পনার সাথে বাস্তবের কোনো মিল দেখা যায় না। পরিকল্পনা করা হয় এক আঙ্গিকে, আর উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি চলে ভিন্ন গতিতে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর সমস্যা দূরীকরণের সুপারিশ

Recommendations for eliminating problems of the state organization of Bangladesh

ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবসায় স্থাপন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার একটি ফসল। এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র কী, এর সুফল কীরূপ এ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের থাকা প্রয়োজন। তদুপরি দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার প্রধান শর্ত হতে হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, অতীতে পাকিস্তানি আমলে যারা ধনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে লালন করেছেন তাদেরকে দিয়েই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রত্যেককে সুস্পষ্ট দায়িত্ব প্রদান এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল।

বর্তমানে এদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হতে পুঁজি প্রত্যাহার বা বেসরকারি মালিকানায় ব্যবসায় ছেড়ে দেওয়ার নীতি পালিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এখনো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রয়েছে সেক্ষেত্রে কোনো কোনো মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেগুলোতে লোকসান দেখানোর চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ লোকসান প্রদর্শিত হলে সরকার এসব কারবার ছেড়ে দেবেন এবং তা এসব চক্রান্তকারীরা হস্তগত করতে পারবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়গুলোকে লোকসানের হাত হতে বাঁচানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ:** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। তদুপরি একটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ সমস্ত উৎপাদন শিল্পগুলোর লক্ষ্যমাত্রার যোগফলকে উক্ত কর্পোরেশনের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. **তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন:** যারা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করেন তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে এসবের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন কার্যের সাথে যারা সরাসরি সম্পর্কিত তাদের নিকট হতে তথ্য গ্রহণ করতে হবে। শহরে পরিবেশে থেকে কোনোরূপ পরিকল্পনা বা নির্দেশ চাপিয়ে দিলে চলবে না।

৩. **ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে মূল উদ্দেশ্য ঠিক করে প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের জন্যে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সাফল্য ও ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করারও সুযোগ থাকতে হবে।

৪. **প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ:** প্রতিটি কর্পোরেশনে, প্রতিটি শিল্প ইউনিটে কিংবা প্রত্যেক ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। কারণ ক্ষমতা ব্যতীত দায়িত্ব পালন অসম্ভব।

৫. **সঠিক নীতি নির্ধারণ:** প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকেই নিত্য নানাবিধ কাজ করতে হবে। যেমন- ক্রয়, বিক্রয়, পরিকল্পনা, উৎপাদন, নিয়োগ, মূল্য নির্ধারণ, অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন যাতে করে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনে নিজেরাই এসব বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৬. **যোগ্যতাভিত্তিক পদোন্নতি:** কর্মচারী-কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দানের ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পদোন্নতি দিলে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

৭. **বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ অফিসার নিয়োগ:** গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

৮. **অফিসারদের প্রশিক্ষণ দানঃ** প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কিংবা বিদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. **নিরীক্ষণ ব্যবস্থাঃ** ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ হতে শুরু করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত ভিত্তিতে নিরীক্ষণ কার্য চালাতে হবে। এতে কোনো খাতে ভুলভ্রান্তি হলে, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পথে বাধা থাকলে ধরা পড়বে। ফলে ব্যবস্থাপকগণ সংশোধিত হতে পারবেন।

১০. **বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনঃ** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই বাজেটের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এতে অপচয় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর সমস্যাগুলো অনেকখানি লাঘব হবে বটে কিন্তু একেবারে নির্মূল হবে না। ঘুণে ধরা অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার সমস্যা পাহাড়সম। এদেরকে একবারে কখনই নির্মূল করা সম্ভব নয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ বর্তমানে মিশ্র অর্থনীতির দেশ। এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বকাল হতেই অর্থাৎ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানি আমলেও এদেশে রাষ্ট্রীয় কারবারের অস্তিত্ব ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন সরকার রাষ্ট্রীয় নীতিগুলোর অন্যতম হিসেবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে মর্যাদা দেন। আর সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ২৭নম্বর আদেশ মোতাবেক অবাঙ্গালী ও এদেশীয় মালিকদের বহু কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে দেশের সকল সম্পদের মালিক হবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাট শিল্প, বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য শিল্প-কারখানাসহ ব্যাংক, বিমা ইত্যাদিও ছিল। তবে বিদেশি কতিপয় ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় আনা হয়নি। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নিয়ে যে টানাহ্যাঁচড়া চলছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় অত্যন্ত কঠিন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ দেশের ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে কয়েক দফা। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতির তালিকা হতে সমাজতন্ত্রের নাম বাদ পড়েছে। বিভিন্ন মহলের ষড়যন্ত্র, কর্মচারীদের দুর্নীতি ইত্যাদির ফলে ক্রমাগত দেওয়া লোকসানের চাপ হতে বাঁচার জন্য বর্তমান বহু কলকারখানা বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছুটা প্রশান্তি বয়ে আসবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কাকে বলে? রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।
২. কীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে কী কী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়?
৪. কী কী উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলতে কী বোঝেন? একটি দেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৬. একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৭. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থিত পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৮. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বর্ণনা দিন।
৯. বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করুন।
১০. বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ত্রুটিসমূহ কী কী?
১১. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন। এর উদ্দেশ্য ও সুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।
১২. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পক্ষে কী কী যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন?
১৩. বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাসমূহ কী কী? রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করবেন?